ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 08. No. 01. February 2013

নওগাঁ জেলার ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পুরাকীর্তি: একটি বিশ্লেষণ

ড. মোহাম্মদ শামসুল আলম*

সারসংক্ষেপ: নওগাঁ জেলা বাংলাদেশের মানচিত্রে যেমন অন্যতম বৃহত্তর, তেমনি ঐতিহ্যগতভাবেও সমৃদ্ধ। এখানে পাল আমল থেকে শুরু করে ১৯৫০ খ্রি. জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি ও নিদর্শন জাতীয় স্থাপনা স্থাপিত হয়েছে। এ জেলায় পালযুগের অন্যতম প্রধান স্থাপনা সোমপুর বৌদ্ধ বিহারটিও অবস্থিত। রাজা-বাদশাদের অনেক স্থাপনা আজো চিত্তাকর্ষকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। জেলায় অবস্থিত সামন্ত রাজাদের নিদর্শনাবলিও ঐতিহ্যের কথাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মধ্যযুগের কারুকার্য খচিত ও শোভিত ধর্মীয় স্থাপনাগুলোর কোনো কোনোটির অবস্থা ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। কোনোটি বা তার ঐতিহ্য হারিয়ে যেতে বসেছে। আবার কোনোটি বা পুরোপরি বিলিন হবার পথে। কিছু কিছু উঁচু ঢিবি আজো জেলার ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। মোটকথা ইতিহাস-ঐতিহ্যগতভাবে নওগাঁ জেলা যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি ধন্য-ধান্যেও জেলাটির ঐতিহ্য আজ সমানভাবে অক্ষুন্ন হয়ে আছে।

বাংলাদেশের মানচিত্রে নওগাঁ জেলা একটি ঐতিহাসিক স্থান। এ জেলা বরেন্দ্রীর অংশ।[১] বরেন্দ্রীর অংশ হিসেবে নওগাঁর গুরুত্ব বাংলাদেশের মানচিত্রে অত্যাবশ্যক। জেলার আয়তন ১৩৩৭ বর্গমাইল বা ৩৪৪৯ বর্গ কিলোমিটার।[২] বৃহত্তর এ জেলায় আছে বহু পুরাকীর্তি, ঐতিহাসিক স্থান ও এর ঐতিহ্যসমূহ। এ সব প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাগুলো নিদর্শন হিসেবে আজো টিকে আছে। ইতিহাসের পাতায় সেগুলোর যেমন পরিচয় আছে তেমনি আছে ঐতিহাসিক অন্তরকথা, সংস্কৃতিগত ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং বিশ্বাস-সংস্কারর পালনীয় কিছু নিদর্শন। জেলায় যে সব ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তি আছে সেগুলোর পরিচয় ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই আলোচ্য নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এ পর্বে তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস গৃহীত হবে।

দুবলহাটির রাজবাড়ি

জেলা শহর থেকে প্রায় ৭ কি.মি.দক্ষিণে এ রাজবাড়িটি অবস্থিত। জেলার ঐতিহাসিক নিদর্শন সম্বলিত দুবলহাটির রাজবাড়িটি অতি পুরাতন। দুবলহাটির জমিদার বাবু ছিলেন অত্যন্ত প্রতাপশালী। ব্যবসা উপলক্ষ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং রাজ-রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির স্থাপন করেন।[৩] ধীরে ধীরে তাঁরা আশেপাশের প্রচুর জমির মালিক হন। দুবলহাটি রাজবাড়ির দোতলায় ছাদের প্যারাপিটে নির্মিত কয়েকজন ইউরোপীয় পুরুষ ও রমণীর পূর্ণাবয়ব শিলামুর্তি বা স্ট্যাচু দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিলামুর্তিগুলোর শরীরের গঠন,

* সহকারি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ, নওগাঁ।

কোকড়ানো চুল এবং পোশাকের ভাঁজ উপমহাদেশেরর অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ ভাস্কর্যের অনুকরণ বলা যেতে পারে। রাজবাড়ির ভিতরের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নিত্য-নৈমিত্তিক উৎসব আনন্দের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[৪] কিংবদন্তি হিসেবে জানা যায় যে, আছে যে এ অঞ্চলে কোনো ফসল উৎপন্ন হতো না। এলাকার এ অঞ্চলটি নিচু বা ডুবো হওয়ায় ডুবো মহলের অজুহাতে দুবলহাটির জমিদার কই মাছ দিয়ে কর পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। জমিদারকে বাইশ কাহন কবজী মৎস্য কর স্বরূপ দিতে হতো। বর্তমানে এ জমিদার বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হতে চলছে। বিশাল আকৃতির এ জমিদার বাড়িটির ইতিহাস-ঐতিহ্য ও কিংবদন্তি আজ হারিয়ে যেতে বসেছে।

বলিহার রাজবাড়ি

নওগাঁ শহর হতে ১১ মাইল পশ্চিমে বলিহার রাজবাড়ি অবস্থিত। বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৪-১৮৯৪) সমকালীন বলিহারের মহারাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় (১৮৩৪-১৮৯৮)। উত্তরবঙ্গের সাহিত্য সাধকদের মধ্যে ছিলেন প্রতিভাধর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব। সৃষ্টি বৈচিত্র্যে, চৈতন্য গভীরতায় এবং কলাকুশলতায় তাঁর সাহিত্যকীর্তি অসাধারণ কিছু না হলেও তাঁর বাণীভঙ্গি বঙ্কিমযুগের মানসিকতা ও পরিবৃত্তকে স্পর্শ করে আছে।[৫] কৃষ্ণেন্দ্র রায় জমিদারির দায়িত্ব গ্রহণ করে রাজ পরিবারের ঐতিহ্যকে অধিকতর সমৃদ্ধ করেন। শিক্ষা-সংস্কৃতির সুপরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করেন। সমাজ থেকে কুপ্রথার বিলোপ সাধনে নানাভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুলীন প্রথার নিবর্তনে, কন্যাদায় গ্রস্থদের বিপদ ত্বরণে,আপদ কালীন সময়ে বিশেষ করে দুর্ভিক্ষ,বন্যা,মহামারী ইত্যাদি দুর্বিপকে তিনি যথাসাধ্যভাবে আর্তদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন অকাতরে। এ মহৎ প্রাণ জমিদার বলিহারের রাজবংশে গৌরব তিলক হিসেবে সে কালে বিবেচিত হতেন। শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। রাজশাহী কলেজের প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৮৭৩),রাজশাহী এসোসিয়েশন-এর (১৮৭২) সূচনাকালে এবং আরো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তিনি সাধ্যমত অর্থদান করেছেন। রাজশাহী এসোসিয়েশনের তিনি ছিলেন দ্বিতীয় সভাপতি। এ মহৎপ্রাণ রাজা বাহাদুর ১৮৯৮ সালে পরলোকগমন করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য কর্মের বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে পুষ্ট করেছে। তিনি তাঁর এ মানস সৃষ্টির জন্য আজো নওগাঁবাসীর স্মরণীয় ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে বিদ্যমান। এ বলিহারের রাজার রাজবাড়িটির সম্মুখে কারুকার্যময় অলঙ্করণ বিশিষ্ট মন্দির এবং বিশাল দ্বিতল রাজবাড়িটি দর্শকরে নিকট আকর্ষণীয়। এছাড়াও বলিহারে বহু পুকুর-দীঘি দেখা যায়। এ পুকুর দীঘি সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তা এমন-আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এগুলো খনন করেন।[৬] বলিহারের নয় চাকার রথ এতদ্ অঞ্চলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। বাৎসরিকভাবে এ রথের মেলা এখনো অনুষ্ঠিত হয়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে এখানে একটি রাজ রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাশিমপুর জমিদার বাড়ি

সম্রাট আকবরের শাসনামলে জনৈক শিবরাম নামক এক ব্যক্তিকে কাশিমপুরে জায়গীর দেওয়া হয়। এ শিবরাম ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ এবং কাশিমপুর জমিদারগণের আদিপুরুষ। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমলে কাশিমপুরের জমিদার রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। নদীর ধারে ঘরের মতো সূচালো চালবিশিষ্ট বিশ্রামাগার এবং রাজপ্রসাদের কক্ষগুলোর দেয়ালের গ্লেজড্ টাইল বা মিনাকরা অলঙ্কৃত

টালিগুলো দর্শকদের আনন্দ ও বিনোদনের বস্তু।[৭] নওগাঁ শহর থেকে ৬ মাইল দক্ষিণে যমুনা নদীর তীরে কাশিমপুর জমিদার বাড়িটি অবস্থিত। রাণীনগর উপজেলার অন্তর্গত ছোট যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত একটি জমিদার প্রধান গ্রাম কাশিমপুর। এ গ্রামের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, সম্রাট আকবরের সময় কাশিম খাঁ নামক এক পাঠান জায়গীরদার এখানে বাস করতেন। তার নাম অনুসারেই এ গ্রামের নাম কাশিমপুর হয়েছে।[৮] মহারাজা মানসিংহ কাশিম খাঁর জায়গীর বাজেয়াপ্ত করে এক হিন্দু ব্রাহ্মণের নিকট পত্তন করেন। এ ব্যক্তি চৌধুরী জমিদারগণের পূর্বপুরুষ। বিভাগ পূর্বকালে এ জমিদারির অংশগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ছিল। কাশিমপুরের রায়বাহাদুর এষ্টেটই ছিল প্রধান জমিদারির অংশ। এ এষ্টেটের পূর্বপুরুষ গিরিশচন্দ্র লাহিড়ীর আমলে জমিদারির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। গিরিশচন্দ্রের পুত্র কেদার প্রসন্ন লাহিড়ী রায়বাহাদুর উপাধিটি পেয়েছিলেন। রায়বাহাদুরের পুত্র শেষ জমিদার অন্নদা প্রসন্ন লাহিড়ী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বিদ্যান ব্যক্তি ছিলেন। কাশিমপুরের চৌধুরী বংশের এবং লাহিড়ী পরিবারের কেহই আর এখন বাংলাদেশে নেই।

শৈলগাছী রাজবাড়ি

দুবলহাটি রাজবংশের এক শাখা শৈলগাছী রাজবাড়িটি। নওগাঁ সদর থানার অন্তর্গত ছোট যমুনা নদীর তীরবর্তী প্রায় দশ কি.মি.দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে ধুবলহাটির জমিদার সাহেব বাসস্থান নির্মাণ করেছিলেন। তবে এখানকার জমিদারির অংশ বিশেষ ছিল খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে।[৯] সে কারণেই শৈলগাছীতে এ রাজবাড়িটি স্বল্প পরিসরে স্থাপিত হয়েছিল। এখানে উলেখযোগ্য কোনো কারুকার্য নেই বলা যায়। তবে এর নিদর্শন ঐতিহ্যগতভাবে এখনো রয়েছে। পরবর্তীতে জমিদারিতে বহু উত্থান-পতন ঘটেছিল। জমিদারগণের প্রস্থানের পর গ্রামের সেই ঐতিহ্য আর নেই। এমন কি জমিদারের বাড়ির কোনো চিহ্নও আর দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল শুধুমাত্র ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

মহাদেবপুর জমিদার বাড়ি

মহাদেবপুর উপজেলায় অবস্থিত জমিদার বাড়িটি জেলা শহর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি দূরে অবস্থিত। এখানকার জমিদার ছিলেন রায়বাহাদুর নারায়ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী। তিনি ছিলেন জমিদার বংশের অধস্তন পুরুষদের মধ্যে শেষ জমিদার।[১০] তাঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন নয়নচাঁদ মুখোপাধ্যায়। নয়নচাঁদ জমিদারি প্রাপ্তির পর তাঁর নিজ নামের সাথে মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে উপাধি হিসেবে 'রায় চৌধুরী' ব্যবহার করতেন।[১১] পরবর্তীতে তাঁর ব্যবহৃত এ পদবী উত্তরাধিকারীগণও ব্যবহার করতেন। রায়বাহাদুর নারায়ণ চৌধুরী ছিলেন এখানকার শ্রেষ্ঠ ও বহুল আলোচিত জমিদার। নারায়ণ চৌধুরী ছিলেন সংস্কৃতিমনা ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাড়িতে প্রায় নিয়মিত গানবাজনা,যাত্রাগানের আসর ও লোকনাট্যের বসতো। বাড়ির পাশেই ছিল একটি থিয়েটার। থিয়েটারের একজন শিল্পী হিসেবে তিনি নিজেও অভিনয় করতেন। বাদক হিসেবে তিনি নিজেই হারমোনিয়াম বাজাতেন। সাহিত্যিক আসরও সপ্তাহব্যাপী তাঁর বাসায় অনুষ্ঠিত হতো। জমিদারির সময়কালে প্রতিবছর এখানে 'রথের মেলা' ইৎসব পালন করা হতো। মুসলমান প্রজাদের জন্য তিনি তাঁর বাড়ির পাশে অবস্থিত দীঘিটির ঘাট বেঁধে দিয়েছিলেন। বর্তমানেও সে ঘাটটি দেখা যায়। যদিও বা এ ঘাটটি বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। জমিদার বাড়ির ধ্বংসপ্রাপ্ত উপকরণগুলো কালের সাক্ষী হিসেবে স্মৃতি ধারণ করে আছে। বর্তমানে এ জমিদার

বাড়িতে যাঁরা বসবাস করছেন তাঁদের অবস্থাও শোচনীয়। ভারত থেকে আগত মরহুম আব্দুল হামিদ খান এর পুত্রদ্বয় এ বাড়িতে বাস করছেন। লাল মোহাম্মদ ও মুক্তা নামের দু'জন ভ্রাতা এ জমিদার বাড়িটির বর্তমান উত্তরাধিকার। কিছু অংশ মহাদেবপুর সরকারি কলেজের ভবন অবস্থিত। জমিদার বাড়ির উত্তর পার্শ্বে একটি পুরাতন মন্দির আছে। 'রঘুনাথ জীও' মন্দির নামে এ মন্দিরটি এখানে পরিচিত। বাড়ির ভেতরের কারুকার্যময় খচিত দালানগুলো সম্পূর্ণ বিনষ্ট অবস্থায় পড়ে আছে। জমিদার বাড়ির সামনে একটি বৃহৎ আকারের দীঘি অবস্থিত। দীঘিতে যে সানবাঁধানো ঘাটটি আছে তা এখন প্রায় চলাচলের অনুপযোগী হয়েছে। এ দীঘির পানি কালো মেঘের রঙ-এর মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ছিল। বর্তমানে পানির সে রঙ-এরও পবিবর্তন এসেছে। পূর্বে এ দীঘির পানি পান করা হতো। এখন সে সব শুধু স্মৃতি হয়ে আছে। তবে জমিদার বাড়ির প্রধান ফটকটি আজো একই অবস্থায় ঐতিহ্য ধারণ করে আছে। ফটকের মাথায় জমিদার আমলের নির্মাণ করা কারুকার্যময় শিল্পকলার নিদর্শনসমূহ দর্শকদের আকৃষ্ট করে। দেয়ালের মাথায় বসানো সিংহমূর্তির ভাস্কর্য দু'টি যেন শিল্পের আদি নিদর্শন ও কারুকার্য।[১২] মূল ফটকের সামনে অবস্থিত পুরাতন জমিদার বাড়ির একাংশটি সংস্কার করে বর্তমানে ছাত্রাবাস করা হয়েছে। যে জমিদার বাড়িতে একসময় জনসাধারণে প্রবেশাধিকার ছিল সংরক্ষিত। আজ সেখানেই চলছে সর্ব সাধারণের রাজত্ব ও আনাগোনা। জাতি লুপ্ত হলেও থাকে তাঁর ইতিহাস। তারই ধারাবাহিকতায় এ রাজবাড়িটির কথা লোকান্তরে আজো রয়েছে মানুষের মনে ইতহাস ও ঐতিহ্যের চিহ্ন হিসেবে।

পতিসর

আত্রাই উপজেলার একটি মফস্বল পাড়াগ্রাম *পতিসর*। এ গ্রামেই অবস্থিত বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছারি বাড়িটি অবস্থিত। এখানকার কালিগ্রাম পরগণা নিয়ে কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের ছিল বিশাল জমিদারি। জমিদারির প্রধান কাছারিটি ছিল পতিসরে। জমিদারি দেখাশোনার জন্য বাবার নির্দেশে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) পতিসরে প্রথম আসেন ১৮৯১ সালের জানুয়ারি মাসে। তিনি এখানে এসে নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলার বিশুদ্ধরূপ দেখে যেমন মুগ্ধ হয়ে পড়েন ভাবনায়। কবির ভাষায়-"মাতৃভাষার যথার্থ স্বরূপ গ্রামেই। এ এখানেই প্রাণের নিকেতন। লক্ষ্মী এখানেই তাঁহার আসন সন্ধান করেন।"[১৩] গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য,অশিক্ষা,অস্বাস্থ্য সর্বোপরি দুঃস্থ জীবন যাত্রার দৃশ্য ও ছবি দেখে তিনি রীতিমতো বিচলিত হয়ে ভাবনায় পড়েন। ফলে তাঁর মনের ভাবনা ও চিন্তায় এসে পড়ে আকস্মিক পরিবর্তন। প্রকৃতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ ও অবিভূত কবি রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই বিচলিত না হয়ে পারলেন না। কবির সংবেদনশীল মনে জাগ্রত হয় মানবতাবাদের। কবি নিজের ভাষায় শোনা যায়-"আহা,এমন প্রজা আমি দেখি নি-এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এ-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটল বিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে,এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার মন বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক,এরা যেন আমার একটি দেশ জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এ-সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষা-ভূষোদের আপনার মনে করতে বড় একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে-তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা

আছে"![১৪] সাধারণ মানুষের মুক্তির প্রত্যাশায় তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন। শুধু তাই নয়, সেই সাথে তাঁর অন্তরেও স্থান পায় পল্লীভাবনা ও সমাজভাবনা। পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী পুনর্গঠন নিয়ে ভাবতে থাকেন। দরিদ্র কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষ তাঁর ভাবনার বিষয় হিসেবে ওঠে আসে। তখন কৃষক আর শ্রমজীবী মানুষের বড় সমস্যা ছিল মহাজনী ঋণের। জমিদার রবীন্দ্রনাথ জানতেন মহাজনী ঋণের খপ্পরে পড়ে দরিদ্র কৃষকদের সর্বস্বান্ত হতে হয়। দারিদ্র্যকে দূর করার জন্য তিনি কালিগ্রামে স্থাপন করেন *কৃষি সমবায় ব্যাংক*। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কালিগ্রাম কৃষি সমবায় ব্যাংক'। ১৯১৩ সালে পাওয়া নোবেল পুরস্কারের ১ লাখ ৮ হাজার টাকা ঐ কৃষি সমবায় ব্যাংকে জমা রাখেন। প্রায় ২০ বছরের অধিক সময় ধরে ব্যাংকটি চালু ছিল।[১৫] কৃষক প্রজারা যখন খাজনার ভারে জর্জরিত, দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত তখন তিনি তাদের খাজনা মাফ করে দিয়েছিলেন। সুদখোর মহাজনদের হাত থেকে এ অঞ্চলের কৃষক সমাজকে রক্ষা করার জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। যা সহজ শর্তে কৃষকরা তা পেয়ে যেতেন। কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য যান্ত্রিক পদ্ধতির চাষাবাদ ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কবির প্রিয় পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এমেরিকার কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষিতে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করানোর পর পতিসরের কৃষির জন্য প্রিয়পুত্রকে নিয়োগ দিয়েছিলেন। ফলে কালিগ্রাম হয়ে ওঠে মহাজনের শোষণমুক্ত অঞ্চল। পতিসর তথা কালিগ্রাম পরগনা এভাবেই রবীন্দ্রনাথের কাছে চির ঋণী। জমিদার, মানুষ ও কবি এ তিনটির সমন্বয়ে রবীন্দ্রনাথের যে ব্যক্তিসত্ত্বা তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় পতিসরে।[১৬] তবে ছোট হলেও গ্রামটির পরিচয় দেশব্যাপী আজ সুপরিচিতি লাভ করে আছে। পতিসরের নাগর নদীর তীরে ছিল কাচারি বাড়িটি। জানা যায় এ কাচারি বাড়ির দালানের পশ্চিম দিকে ছোট বড় মিলে মোট ১৭টি ঘর ছিল। প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা এ কাচারি বাড়িটি সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে মুখরিত থাকতো। এ কাচারি বাড়িটিতে যেসব উৎসব পালন হতো সেগুলোর মধ্যে ছিল পহেলা বৈশাখ, পূণ্যাহ অনুষ্ঠান ও হালখাতা অন্যতম। হালখাতার দিনে প্রজাগণ খাজনা পরিশোধ করে দধি,চিড়া ও মিষ্টি খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। পতিসরের দ্বিতীয় উৎসব ছিল ২৫ বৈশাখ অর্থাৎ কবির জন্মদিন। সারা দিন ধরে জন্ম উৎসব পালিত হতো। প্রভাতে প্রভাত ফেরি বের হতো। প্রভাত ফেরিটি সিংহদ্বার থেকে বাদ্য বাজনাসহ যাত্রা শুরু করে 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলি তলে' গেয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষে আবার সিংহদ্বারে এসে শেষ হতো। এতে স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক, আমলা, কর্মচারি, সাধারণ প্রজা সবাই অংশ গ্রহণ করতো। সিংহদ্বারের পিছনে রাখা হতো কবির প্রতিকৃতি। প্রতিকৃতিতে প্রদান করা হতো মাল্য ও পুষ্প। কবির জন্ম দিনে বা কোনো সময় রাতোয়ালের বড় জোতদার আকবর আলী আকন্দ সাহেব বিখ্যাত লাঠিয়াল দল পাঠিয়ে করি গুরুর মনোরঞ্জন করতেন। কবি গুরু লাঠিয়ালদের লাঠিখেলা খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করতেন। পতিসরে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশুদ্র, হিন্দু, মুসলমান ইত্যাদি গোত্র ও বংশের মানুষ বাস করতেন। কাচারি বাড়ির সন্নিকটে ছিল বাসুদেবের প্রস্থরময় মূর্তি সুশোভিত মুণী ঠাকুরের মন্দির। এ মন্দিরে প্রতিদিন পূজা উপলক্ষ্যে রাজভোগ দেওয়া হতো। পতিসরে কবির পুত্রের নামানুসারে একটি হাইস্কুল পতিষ্ঠা করা হয় ১৯৩৭ সালের ২৬ জুলাই। যার নাম কালীগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইন্সটিটিউট। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পর এর ব্যয়ভার ও পরিচালনার জন্য প্রায় ৫৪.৬১ একর জমি দান করেন। বর্তমানে এখানে একটি রবীন্দ্রনাথ কৃষি প্রযুক্তি ইন্সটিটিউট স্থাপন

করা হয়েছে। এছাড়াও ছিল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। প্রতিষ্ঠানগুলো রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রতিষ্ঠা করেন। যা কাচারির প্রজা হিতৈষী ফাণ্ড থেকে এর ব্যয়ভার নির্বাহ করা হতো। পতিসরে প্রতি বছর ২৫ বৈশাখ (জন্ম জয়ন্তী) আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে প্রায় ৩ দিন থেকে ৭ দিন ধরে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করে দিবসটি পালন করা হয়। কবির জন্ম দিন উপলক্ষ্যে প্রতি বছর এখানে গ্রামীণ মেলার আয়োজন হয়। প্রায় সাত দিন ধরে এ মেলা চলে। গ্রামীণ মেলা বলতে যা বোঝায় জন্মজয়ন্তীতে তার সব ধরনের আয়োজন হয়ে থাকে। মেলায় বিভিন্ন ধরনের ফার্নিচারসহ প্রসাধনী সাসগ্রির নানা উপাদান-উপকরণ এসে মেলার কলেবরকে ব্যাপকভাবে মুখরিত করে তোলে। এ অঞ্চলে তখন ব্যাপক ধুমধাম পড়ে যায়। এখানকার মানুষ মেলা উপলক্ষ্যে মেয়ে-জামাই আনা-নেয়াসহ অত্মীয়-স্বজনের আনাগোনায় ঈদ আনন্দের মতো তখন উৎসব পালন করে। সামগ্রিকভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ, গান পরিবেশন, রবীন্দ্র গবেষকদের জ্ঞান-গর্ব আলোচনা ও স্মৃতিচারণের মাধ্যমে দিবসটি প্রতিবছর পালিত হয়ে আসছে। কবির শেষ আগমন ঘটেছিল পতিসরে ২৭ জুলাই ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। আমাদের ছোটনদীসহ অসংখ্য বিখ্যাত কবিতা, গান, ছিন্নপত্র এ পতিসরে কবি রচনা করেছেন।

মাহীসন্তোষ

থানা সদর থেকে প্রায় ১৩কি.মি.উত্তর-পশ্চিমে মাহীসন্তোষ আত্রাই নদীর তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত। ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক ব্যাকম্যানের মতে পাল রাজা প্রথম মহীপালের (৯৯৫-১০৪৩) নামানুসারে এ স্থানের নাম হয়েছে মাহীসন্তোষ। পাল শাসনামলে মাহীসন্তোষ একটি সমৃদ্ধ নগর ছিল বলে মনে করা হয়। কারণ এখানে মুসলিম পুর্বযুগের বহু প্রত্নিদর্শন পাওয়া গেছে। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজি বাংলা বিজয়ের পর মাহীসন্তোষ একটি ইকতা বা প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়। বখতিয়ার খলজি তাঁর সঙ্গী মুহম্মদ শিরান খলজিকে মাহীসন্তোষের মুকতা বা শাসন নিযুক্ত করেন। শিরান খলজি মৃত্যুবরণ করলে মাহীসন্তোষে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ইলিয়াসশাহী বংশের সুলতান রুকুনউদ্দীন বারবাক শাহের রাজত্বকালে এটি উত্তরবঙ্গের একটি শক্তিশালী শাসনকেন্দ্র হিসেবে পুনর্গঠিত হয়েছিল।[১৭] সুলতান বারবাক শাহের নামানুসারে পরবর্তীকালে এর নাম হয় বারবাকাবাদ। সুলতান বারবাক শাহ এখানে একটি সামরিক ঘাঁটি ও একটি টাকশাল স্থাপন করেছিলেন। এ টাকশাল থেকে মুদ্রা চালু করা হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধানের ফলে এখানে মুসলমান আমলের মিহরাব খোদাই করা পাথর, শিলালিপি ও পোড়ামাটির ফলক উদ্ধার করা হয়েছে। এখানে প্রাপ্ত শিলা লিপির মধ্যে দুটি দিনাজপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্ট ম্যাকট উদ্ধার করেছিলেন। দু'টি লিপিতেই মসজিদের কথা উল্লেখ আছে। ড. ইয়াকুব আলীর মতে দুটি শিলালিপি একই মসজিদের। এগুলোর সময়কাল ১৪৬০-৬১ ও ১৪৭১-৭২। সুখময় মুখোপাধ্যায় মাহীসন্তোষের শিলালিপি সম্পর্কে ভিন্ন কথা বলেছেন। তাঁর মতে মাহীসন্তোষের তিনটি শিলালিপি পাওয়া গেছে। তার দু'টিতে ইকরার খানের নাম আছে। আর শেষেরটিতে শুধু তার উপাধি উল্লেখ আছে। প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে এ মসজিদটি ১৫০৭ খ্রিঃ সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯) আমলে বিন সুহাইল বা সুহাইলের পুত্র কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। আলোচ্য মসজিদে দশটি গম্বুজ ও অভ্যন্তরে দুটি অলিন্দ বা খিলান পথ ছিল। আবার অনেকের মতে পনেরটি গুম্বুজ ছিল। ধংসপ্রাপ্ত

মসজিদের গম্বুজের সঠিক সংখ্যা নির্ণয় এখন দুরুহ ব্যাপার। মসজিদটি গৌড়ের ছোট সোনামসজিদের অনুরূপ ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন। হযরত মাওলানা তকী উদ্দীন আল আরাবী নামে একজন সুফী সাধক খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহীসন্তোষে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেছিলেন। দুর দুরান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এসে এখানে শিক্ষা লাভ করতো। বিহারের একজন মুসলিম সাধক শায়খ এহিয়া মনেরী বাংলাদেশে মাওলানা তকীউদ্দীন আরাবীর নিকট দ্বীন-ই-এলেম শিক্ষা করেন। এ স্থানের নামকরণ ও পরিচিতি নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন সংস্কৃত 'মহী' শব্দের সাথে ফারসি 'গঞ্জ' শব্দের সংযোগে এ স্থানের নাম হয়েছে 'মাহীগঞ্জ'। অন্যমতে 'মায়ি'(মা) শব্দের সাথে সন্তোষ সংযোগে মাহীসন্তোষ নামকরণ হয়েছিল।

হরগৌরীর মন্দির

জয়পুরহাট জেলা শহর থেকে প্রায় ১০কি.মি.পশ্চিমে এবং জেলার ধামইরহাট থানার অন্তর্গত মঙ্গলবাড়ি নামক স্থান থেকে দক্ষিণে এ ঐতিহাসিক মন্দিরটির অবস্থান। মঙ্গলবাড়ি বাজার হতে প্রায় এক কিলোমিটার দক্ষিণে *ভীমেরপান্টি* নামক স্থানটি অত্র অঞ্চলের ঐতিহাসিক স্থান হিসেবে বিশেষভাবে সুপরিচিত। ভীমের পান্টির প্রায় ৩০০ গজ উত্তরে রাস্তার মোড়ে এবং উত্তর ও পশ্চিম দিকের রাস্তা সংলগ্ন একটি ঢিবি আছে। প্রায় দেড় বিঘা ভূমির ওপর এটি অবস্থিত। পূর্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘ এ ঢিবির আয়তন প্রায় ৪৫ মিটার ×৩০ মিটার এবং উচ্চতা প্রায় ৪.৫ মিটার। ঢিবির উপরে খুব সম্ভব ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে নির্মিত একটি মন্দিরের ছাদবিহীন অস্তিত্ব কোনো রকমে টিকে আছে। মন্দিরের ভিতরে আলিঙ্গনরত অবস্থায় একটি হরগৌরীর মূর্তির ভগ্নাবশেষ আছে। কাল পাথরের নির্মিত মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় ১.২১ মিটার।[১৮] তবে এ মূর্তিটি যে দেখতে খুব সুন্দর ছিল তা বলার অবকাশ রাখে না। স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন তেল-সিঁদুর দিয়ে এ ভগ্ন মূর্তিটিকে পূজা দিয়ে থাকেন। এটি ছাড়া মন্দিরের ভিতরে আর কোনো মূর্তি নেই। মন্দিরের বাইরে ঢিবির ওপর বেশ কয়েকটি ভগ্নাংশ মূর্তি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এ ভগ্ন জরাজীর্ণ ঢিবিটির মধ্যে যে হাল আমলের কোনো ঐতিহাসিক প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ লুকায়িত আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঢিবির ওপর প্রাচীন ইট ও পাথরের ভগ্নাংশের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। আবার স্থানে স্থানে ইষ্টক নির্মিত প্রশস্ত ভিত্তির দেয়ালের অস্তিত্বও দেখা যায়। ঢিবির লাগোয়া পূর্ব দিকে আছে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। জলাশয়ের পশ্চিম তীরে আছে ভগ্নপ্রাপ্ত একটি সান বাঁধানো ঘাটের চিহ্ন। মন্দিরটি খুব প্রাচীন ছিল বলে মনে করা হয়। খুব সম্ভব পাল যুগের প্রথম দিকের মন্দির হিসেবে এটির পরিচয় জানা যায়।[১৯] প্রাপ্ত হরগৌরির মন্দিরটির মধ্য দিয়ে জানা যায় এটি একটি শিবমন্দির। এখানে বাদ্দাল নামে একটি শহর ছিল এমন কিংবদন্তির কথাও জানা যায়। বাদ্দালের মিশ্র বংশীয় ব্রাহ্মণরা এ মন্দিরটি নির্মাণ করেন এবং হরগৌরীরর নামে উৎসর্গ করেন। নানাবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ও পূজা পার্বনের জন্য স্থানটি আজো সমানভাবে গুরুত্ব লাভ করে আছে।[২০] পার্শ্ববর্তী বাদ্দাল শহরটিতে মিশ্র বংশীয়দের বসতবাড়ি ছিল। কালক্রমে তা একটি অবহেলিত গ্রামে পরিণত হয়। মঙ্গলবাড়ির এ হরগৌরীর মন্দিরে এখনো দূরদূরান্ত থেকে ভক্তেরা এসে পূজা-অর্চনাসহ মানত করে থাকেন। বর্তমানে মন্দিরটি নব পর্যায়ে সংস্কার করা হয়েছে।

অগ্রপুরী বিহার

পাশাপাশি অবস্থানরত দুটি গ্রাম আগ্রা এবং দ্বিগুণ এ দু'টি গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত স্থানের নাম আগ্রাদ্বিগুণ। দেশ বিভাগের পূর্বে এ স্থানটি ছিল দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। দেশ বিভাগের পর ছিল বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অধীন। বর্তমানে তা নওগাঁ জেলায় অবস্থিত। ধামইরহাট থানার আগ্রাদ্বিগুণ নামক ইউনিয়নের আগ্রাদ্বিগুণ বাজারে একটি বিশাল আকারের স্তুপ আকৃতির দ্বীপ আছে। তিব্বতীয় সাহিত্যে এটিকে অগ্রপুরী বিহার বলা হয়েছে।[২১] বলা হয়ে থাকে এটি প্রাচীন বৌদ্ধ প্রধান অঞ্চল ছিল।[২২] এখানে প্রায় ৬ কি.মি.স্থান জুড়ে বিস্তৃত ইষ্টক নির্মিত পথ ও প্রাচীন অট্টালিকার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। তবে এটিও যে একটি বৌদ্ধ বিহারের অংশ বিশেষ তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। এ বিহারটি পার্শ্বেই কয়েকটি প্রাচীন আমলের দীঘিও দেখা যায়। দীঘিগুলোর নাম দ্বারকাদীঘি, সংহারদীঘি,

ধাকরানী দীঘি ও পাথর দীঘি। উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ এ দীঘিগুলোর ধারে কাছে অসংখ্য প্রাচীন ইমারতের ধ্বংসাবশেষ ছিল। একটি বড় ঢিবি ছাড়া এখানকার সব প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এক একর জায়গাজুড়ে এ ঢিবিটি এখন কোনো রকমে টিকে আছে। প্রায় ৬ মিটার উঁচু ঢিবির মধ্যে প্রচুর প্রাচীন ইট ও প্রস্তর খণ্ড দেখা যায়। ঢিবির পূর্ব,উত্তর এবং পশ্চিম দিক দিয়ে সিএণ্ডবির প্রশস্ত রাস্তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে। এ ঢিবিতে যে সব মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেসব মূর্তিগুলোর কয়েকটি কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম এবং রাজশাহীর বরেন্দ্র মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কাল পাথরের নির্মিত ও গরুড় বাহন বিশিষ্ট একটি বিষ্ণুমূর্তি এবং একজন নারীর মুখমণ্ডলের মূর্তিতে অপূর্ব শৈল্পিক সৌন্দর্য ছিল বলে জ্ঞাত হওয়া যায়।[২৩] বর্তমানে এটি দেশের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন। বিহার বলতে বুঝায় বিদ্যালয় ও উপসনালয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের আমলে নির্মিত এ দ্বীপ বা স্তুপের উচ্চতার আয়তন দেখে মনে হয় এককালে এটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বর্তমানে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ না করার ফলে এ বিহারটি অক্ষত অবস্থায় আছে। বিহারটির খনন কাজ করলে কোনো তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো। বিহারটির ভেতরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ইতিহাস-ঐতিহ্যগুলো আজো সম্পূর্ণ ও অনুদঘাটিত রয়েছে। এ ঢিবিটির মধ্যে যে মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের লুকিয়ে আছে তা স্থানীয় লোকজন বলে থাকেন। তবে এটি হিন্দু না বৌদ্ধ মন্দির তা খনন না করলে সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়।

গড়ুর স্তম্ভ/ভীমের পান্টি

গড়ুর স্তম্ভ বা ভীমের পান্টি পুরাকীর্তিটি ধামইরহাট থানার মঙ্গলবাড়ি নামক স্থান থেকে দক্ষিণে ঐতিহাসিক হরগৌরীর মন্দিরেরও ১০০ মিটার দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে এটি অবস্থিত। স্তম্ভ ও রাস্তার দক্ষিণে প্রায় ১০০ একর পরিমিত যে চাষের ভূমি আছে তা ফাল্গুন চৈত্র মাসেও স্বল্প পরিসরে পানি জমে থাকে। নিচু ভূমির পূর্ব ও দক্ষিণে বেশ কয়েকটি প্রাচীন জলাশয় দেখা যায়। তবে প্রাচীন কীর্তির কোনো উল্লেখযোগ্য ধ্বংসাবশেষ এখানে নেই। স্তম্ভটির দক্ষিণ,দক্ষিণ-পশ্চিম, ও পশ্চিমে আছে সিদ্ধিপুর, ধুরইল,দেওয়ান বাড়ি,ইত্যাদি প্রাচীন স্থানগুলো। এটি অত্র অঞ্চলে বাদ্দাল স্তম্ভ নামেও সুপরিচিত। এখানে বাদ্দাল নামে একটি শহর ছিল। সে শহরে মিশ্র

বংশীয়রা বাস করতেন। এ শহরের নামানুসারে এ স্তম্ভের নাম হয়েছে বাদ্দাল স্তম্ভ।[২৪] স্থানীয় লোকেরা এ পুরাকীর্তিকে ভীমের পান্টি নামে জানেন। 'কৃষ্ণাভ ধূসর প্রস্তরে' নির্মিত স্তম্ভটি বর্তমানে ভগ্ন অবস্থায় অবস্থিত। স্তম্ভটি উপরের অংশ আরো অধিক উঁচু ছিল। আর চূড়ায় ছিল একটি গরুড় মূর্তি। পরবর্তীকালে বজ্রপাতের ফলে স্তম্ভটির মাথার অংশে অবস্থিত গরুড় মূর্তির উপরিভাগ ভেঙে যায়। সেই সাথে স্তম্ভটি এক দিকে হেলে পড়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর এটি রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য স্তম্ভটির চারদিক গোলাকারের বেড়ি দিয়ে ঘেরা হয়েছে। বাঁধানো অংশের পরিধি ৫.৭ মিটার। বর্তমানে যে বাঁধানো বেদি আছে তা থেকে প্রায় ৪১ সেন্টিমিটার উপরে সংস্কৃত ভাষায় ২৮ পংক্তির একটি শিলালিপি আছে। স্তম্ভের গাত্রে যে বজ্রলেপ ছিল তা স্থানে স্থানে ওঠে গেলেও স্তম্ভের গাত্র এখনো মসৃণ।[২৫] এ অঞ্চলে কিংবদন্তি হিসেবে প্রচলিত আছে যে, মহাভারত খ্যাত ভীম রাতে হাল চাষ করতেন এবং প্রভাত হওয়ার আগেই চাষ বন্দ রেখে গৃহে ফিরে আসতেন। একদিন কারণ বশত চাষ করতে তিনি বিলম্বে যান। বিলম্ব চাষ করতে যাওয়ার কারণে প্রভাত হওয়ার আগেই তাঁকে তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসতে হয়। তাড়াহুড়ো করে ফিরে আসার সময় তিনি তাঁর হাতের পান্টিটি ফেলে রেখে আসেন। পরবর্তীতে সকালে মানুষ বের হয়ে দেখতে পায় সে পান্টিটি উপরের দিকে স্তম্ভের মতো দণ্ডায়মান হয়ে আছে। সেই সময় থেকেই স্তম্ভটি গড়ুর স্তম্ভ বা ভীমের পান্টি নামে সুপরিচিত হয়ে আছে। এটি পাল রাজা নারায়ণ পালের (৮৩৬-৯২০) সময়কালে নির্মিত।[২৬] পাল রাজা নারায়ণ পালের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মিত্র বংশীয় ভট্টগুরুব মিশ্র কর্তৃক বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এ গুরুব স্তম্ভটি নির্মাণ করছিলেন।[২৭] এটি একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্তম্ভ। কাল পাথরের এ স্তম্ভটির উচ্চতা ১৬ ফুট ৯ ইঞ্চি। এর গোড়ার দিকের পরিধি প্রায় ছয় ফুট।

জগদ্দল বিহার

ধামইরহাট থানার অন্তর্গত এ বিহারটি জয়পুরহাট-ধামইরহাট রোডের মাঝে পীড়লডাঙ্গা নামক বাজার থেকে উত্তরে প্রায় ৩ কি.মি দূরে জগদ্দল নামক স্থানে অবস্থিত। এ বিহারটি প্রাচীন কীর্তি বা নিদর্শন হিসেবে আজো অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় মানুষ এটিকে বটকৃষ্ণরায় নামক একজন জমিদারের বাড়ির ধ্বংসাবশেষে বলে মনে করেন। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে রামপাল গৌড়রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর রামাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। আইন-ই-আকবরীর রচয়িতা আবুল ফজল এ স্থানকে রমৌতি বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন বাংলার ধর্মমঙ্গলকাব্যে রামাবতীর উল্লেখ আছে। রামপালের পুত্র মদনপালের তাম্র শাসনেও রামাবতী নগরীর উল্লেখ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন যে, এ রামাবতী নগরে রামপাল জগদ্দল মহাবিহারের প্রতিষ্ঠা করেন।[২৮] একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে রামপাল এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে নীহারঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব গ্রন্থে তা উল্লেখ করেছেন। এ বিহারটি দেশের মানুষ তথা নওগাঁ বাসীর অনেকের কাছেই আজো তেমন পরিচিত নয়। অথচ এ বিহারটি প্রাচীন বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রের ক্ষেত্র হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহারের দু'জন স্বনামধন্য পণ্ডিত হলেন আচার্য দানশীল ও বিভূতিচন্দ্র। প্রায় ষাটটির মতো তন্ত্র গ্রন্থের বিব্বতী অনুবাদ করেছেন দানশীল।

রাজপুত্র বিভূতিচন্দ্র ছিলেন একাধারে গ্রন্থকার, টীকাকার, অনুবাদক ও সংশোধক। প্রাচীন বাংলার এমন উন্নত জ্ঞানসাধনার কেন্দ্রটি আজ প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত আছে।

সোমপুর বৌদ্ধবিহার

নওগাঁ জেলার পুরাকীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান স্থান সোমপুর বৌদ্ধ বিহার। এটি নওগাঁর প্রাচীনতম ঐতিহাসিক নিদর্শন। সাতাশ একর জমির ওপর অবস্থিত এ বিহারটি বদলগাছী উপজেলা সদর হতে ১৫/১৬ কিলোমিটার উত্তর পূর্বে এবং জামালগঞ্জ রেলস্টেশন হতে ৪/৫ কিলোমিটার পশ্চিমে পাহাড়পুর গ্রামে অবস্থিত। পাহাড়পুর নামটি বর্তমান কালের দেয়া নাম। আকর্ষণীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য,বিপুল আয়তন ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার আজ বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত।[২৯] এর প্রাচীন নাম সোমপুর। পাল বংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল (৭৮১-৮২১) অষ্টম শতকের শেষদিকে এ বিহার নির্মাণ করেন। বিশাল আকারের এ বিহারটি রাজনৈতিক পট পরিবর্তন,রাজকীয় পৃষ্ঠপোষতকার অভাব,অযত্ন ও অবহেলার কারণে আনুমানিক ১২শ শতকে পরিত্যাক্ত হয়ে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।[৩০] দূর থেকে দেখলে সিলেট অঞ্চলের কোনো পাহাড়ের মতোই পাহাড় মনে হয়। এটির খনন কালে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে জানা যায় যে,এর নাম সোমপুর ধর্মশালা বিহার। রাজকীয় সমৃদ্ধির যুগে রাজা ধর্মপাল ও তার পুত্র দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে এ বিহার ও মন্দির গড়ে উঠে। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক কারণে এ মহাবিহারটি ধ্বংস স্তুপে পরিণত হলেও আজো এ ঐতিহাসিক বিহারটি এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধবিহার হিসেবে সগৌরবে দণ্ডায়মান। বিহারের আয়তন উত্তর দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। মূল দালানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য ১৭৭টি কক্ষ ছিল। আটশত জন ভিক্ষুর জন্য বাসোপযোগী ছিল এ মহাবিহারটি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এখানে একটি যাদুঘর, একটি রেস্টহাউস ও কয়েকটি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করেছেন। ১৯৩৪ সালের খননের ফলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগ এ বিহারের পূর্বদিকে সত্যপীরের ভিটা ও মন্দিরের চতুর্দিক বেষ্টিত কক্ষগুলো ও সমগ্র প্রত্নবিশেষটি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যভাগে প্রধান বিভাগ এবং তাকে ঘিরে ১৯৮টি বাসোপযোগী কক্ষ,বিস্তৃত প্রবেশ পথ,অসংখ্য নিবোদনস্তুপ,ছোট ছোট মন্দির অবস্থিত। সন্ধ্যাবর্তী এখানকার রাজার কন্যা ছিলেন। এ বিহারের প্রস্তর গাত্রে ৬৩টি মূর্তি রয়েছে। মন্দির গাত্রেও বহু জীব-জন্তুর মূর্তিও দেখা যায়। মূল ভূমি থেকে বিহারটির উচ্চতা প্রায় ৭২ ফুট। বিহারটি বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আবাসস্থল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও পরবর্তীতে তা শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ রূপান্তর ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ড.কাদির আধুনিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করেছেন। আধুনিক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এ বিহারে বহু জ্ঞানীজনের আগমন হতো। বিদেশ থেকে বহু জ্ঞানপিপাসু বৌদ্ধগণ এখানে আসতেন। সোমপুর বিহারে বাস করতেন মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র। আচার্য অতীশ দীপঙ্কর কিছুকাল এ বিহারে বাস করেছিলেন। সোমপুর বিহারে আরো অবস্থান করতেন প্রাচীন চর্যাগীতিকার লেখক বাহ্নপা ও তাঁর গুরু হাড়ি পা।[৩১] এ বিহারটির অনেক তথ্য এখনো পরিপূর্ণভাবে উদঘাটিত হয়নি। এমন কি এর অনেক তথ্যই বোধ হয় এখনো পূর্ণাঙ্গ নয়। অনুদঘাটিত তথ্যগুলো লোক চক্ষুর

আড়ালে থেকে গেছে। তবে অদ্যাবধি পাহাড়পুর সম্পর্কে জানার কৌতুহল প্রশমিত হয় নি। এ ঐতিহাসিক স্থানটি স্বচোখে দর্শন না করলে এর বিশালতা ও ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা লাভ সম্ভব নয়। এখানে এলে কত কথায় না মনে আসে। কি নির্মাণ কৌশল, কি প্রযুক্তি,কি মহাপরিকল্পনা,কি রুচিবোধ, কি বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থাপনা সব কিছু মিলিয়ে দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট করে। অনুমান করা হয় যে, একমাত্র সুনিপুনভাবে নির্মিত ও সুপ্রশস্ত এবং ভারী দেয়ালের কারণেই ভগ্নাবস্থাতেও বৌদ্ধ বিহারের প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনগুলো কালের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে অদ্যাবধি টিকে আছে। এখনো ভূমি হতে কেন্দ্রীয় মন্দিরের উচ্চতা ৭০ ফুট। আদিতে এর প্রকৃত উচ্চতা যে কত ছিল তা বর্তমানের অনুমান করা কঠিন। বিহারের পোড়া মাটির চিত্র ও ফলকগুলোর যেমন ছিল কারুকার্য তেমনই ছিল লৌকিক বৈশিষ্ট্য।[৩২] প্রাপ্ত নিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে দেখলে দেখা যায় যে,খুব নামী-দামী পোড়া,মাটির ফলক এ বিহারে ব্যবহার করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় মন্দির ছাড়াও বিশাল পাহাড়ের মতো এ বহিারের অঙ্গনে ছড়িয়ে আছে নানা আকার-প্রকারের অন্যান্য স্থাপত্যের ধবংসাবশেষ। এ সব স্থাপত্য নিদর্শনের বেশির ভাগই বিহারের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এখানে প্রাপ্ত ফলকগুলোতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব,পদ্মপাণি,মঞ্জুশ্রী,তারা ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবদেবী ছাড়াও শিব,ব্রহ্মা,বিষ্ণু,গণেশ,সূর্য ইত্যাদি হিন্দু দেবতার মূর্তিও উৎকীর্ণ আছে। তবে দেব দেবীর ফলক চিত্রের সংখ্যা খুবই নগন্য।[৩৩] নানা জাতীয় ফলকগুলোতে হাজার বছর আগের বাঙালি সমাজ জীবনের অনেক চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। এ সব চিত্র যেমন প্রাণবন্ত তেমনই বাস্তবধর্মী।

হলুদ বিহার

বদলগাছী উপজেলার বিলাসবাড়ি ইউনিয়নের দ্বীপগঞ্জ গ্রামে হলুদবিহার নামে এ স্থানটি অবস্থিত। এ বিহারটি সোমপুর বিহার থেকে ১১/১২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। দীপগঞ্জ গ্রামের হাটের পাশে একটি উঁচু ঢিবিটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ঢিবির পরিধি প্রায় ১০০ ফুট এবং সমতল ভূমি থেকে উচ্চতা প্রায় পঁচিশ ফুট। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ববিভাগ অনুসন্ধান ও জরিপ চালিয়ে স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে, এটি একটি বৌদ্ধ বিহার।[৩৪] এ বৌদ্ধ বিহারটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের সমসাময়িক কালে বৌদ্ধ রাজাদের হাতে নির্মিত বলে ঐতিহাসিকরা ধারণা করে। এ বিহারটি তিন দিকে নিচু জলাভূমি দ্বারা বেষ্টিত বলে স্থানীয় লোকেরা এর নাম দিয়েছে দ্বীপগঞ্জ। এটি খননকালে অনেক বুদ্ধ মূর্তি ও মৃৎফলক পাওয়া গিয়েছে। প্রত্ন বিভাগ খননকালে যে তথ্য উদ্ধার করেছে তা এমন- পাহাড়পুরের প্রত্ন নিদর্শন সমূহের সাথে এখানে প্রাপ্ত নিদর্শনের সাদৃশ্য আছে।[৩৫] এটিকে মাঝারি আকারের রাজবাড়ি বলেও অনেকে মনে করেন। আবার কেউ কেউ এটিকে পাহাড়পুরের সমসাময়িক বলেও মনে করেছেন। তবে পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহারের অনেক পরে নির্মিত বলে মনে হয়। পাহাড়পুর বিহারে ব্যবহৃত ইটের সাথে হলুদ বিহারের যে সব ইট ব্যবহৃত হয়েছে তার মধ্যে আয়তনগত ও দৈর্ঘ-প্রস্থে কোনো মিল নেই। হলুদ বিহারের ইটগুলো ভাঙা ও টুকরো বিশিষ্ট আয়তনের। সিঁড়ির পূর্ব পাশের ইটগুলো নতুন। ।নুমিত হয় যে, সিড়ির পরে তা নির্মাণ করা হয়েছ। হলুদ বিহারের নতুন উটের সাথে পাহাড়পুরের কেন্দ্রীয় মন্দিরের পশ্চিম পাশের ইটের সাথে সামান্য কিছু মিল পাওয়া যায়। হলুদ বিহারের ইটের দৈর্ঘ ৬ ইঞ্চি ও চওড়া সাড়ে ৪ ইঞ্চি এবং ইটের মার্কা পাওয়া

যায় অ.ই.ঋ। অপর দিকে পাহাড়পুরে ব্যবহৃত ইটের সংখ্যা প্রায় দুধরনের। চ.ই.ঋ ও ঋ. ই মার্কা ইটগুলো দৈর্ঘে প্রস্থে উচ্চতা প্রায় সাড়ে সোয়া দু'ইঞ্চি। তবে ঔ.ই.ঋ ইটগুলো ৫-৭ ইঞ্চি চওড়া, ১১/১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ এবং উচ্চতায় পার্থক্য দেখা যায়।[৩৬] বিহারটি সংরক্ষিত ঘোষণা হবার আগেই এর ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

আলতাদীঘি (ধামইরহাট)

ধামইরহাট উপজেলার ধামইর ইউনিয়নের আলতাদীঘি মৌজায় অবস্থিত এ দীঘিটি ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে চলছে। থানা সদর থেকে প্রায় ৩ কি.মি.উত্তর পূর্ব দিকে এ দীঘিটির অবস্থান। দীঘির পাড়গুলো পাহাড়ের মতো উঁচু। এটি পাল আমলে খনন করা হয়েছিল বলে জানা যায়। পাল নৃপতি মহারাজ রামপাল কর্তৃক নির্মিত জগদ্দল মহাবিহার এ জলাশয় থেকে মাত্র ২ কি.মি.দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।[৩৭] এটি বর্তমানে পর্যটন কেন্দ্র ও মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়ে চলছে। চৌদিক প্রাকৃতিক শালবন বেষ্টিত এ দীঘিটি এক কিলোমিটার দীর্ঘ ও অর্ধ কিলোমিটার প্রস্থ। এ দীঘিটি পর্ষটকদের একান্তভাবেই আকৃষ্ট না করে পারে না। কিংবদন্তি সূত্রে জানা যায় যে, পাল রাজাদের সময় বটরাজা নামে এক রাজা পানি/জলের অভাব দূর করবার জন্য একটি বৈঠকের আয়োজন করেছিলেন। বৈঠকে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, রাণী প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যতদূর হেটে যাবেন ততখানি লম্বা একটি দীঘি খনন করা হবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাণী প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে এক কিলোমিটার হেটে যাওয়ার পরও কোনো বিশ্রাম না নিয়ে হেটে যেতেই থাকেন। এ দিকে সিদ্ধান্ত আছে যে,রাণী যতদূর হেটে যাবেন ততদূর পর্যন্ত দীঘি খনন করতে হবে। রাণী যেন বেশিদূর এগিয়ে যেতে না পারেন সেজন্য জনৈক ব্যক্তি রাণীর পায়ে আলতা রং ঢেলে দিয়ে রাণীকে জানান যে, তাঁর পা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। এমন কথা শোনার পর রাণী পায়ের দিকে তাকিয়ে রক্তের মতো দেখতে পান। রক্তের মতো লাল কিছু দেখতে পেয়ে রাণী হেটে চলা বন্ধ করে দেন। কৌশলে রাণীর হেটে চলা বন্ধ না করা হলে,রাণী যতদূর পর্যন্ত হেটে যেতেন;ততদূর পর্যন্ত দীঘি খনন করতে হতো। রাণী দক্ষিণ দিক থেকে উত্তর দিকে যতটুকু হেটেছিলেন ততটুকুই দীঘি খনন করা হয়েছে। দীঘিটির এমন কিংবদন্তী পাওয়া যায় ঐতিহাসিক সূত্রে। এ অঞ্চলের মানুষের মুখেও এমন কথা এখনও প্রচলিত আছে। ধামইরহাট উপজেলায় উপরিউক্ত ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও নিদর্শন ছাড়া আর কোনো প্রাচীন পুরাকীর্তি নিদর্শন নেই। তবে আলতা দীঘির সাথেই অবস্থিত বিশাল আয়তনের শালবনের নিকুঞ্জটি যেন ইতিহাসের অংশ বিশেষকে উল্লক্ষিত করতে চায়।

দিব্যক জয়স্তম্ভ

নওগাঁ জেলার একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক স্থান দিবর দীঘি। সংস্কৃত ধীবর (কৈবর্ত) শব্দ থেকে দিবর শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।[৩৮] থানা সদর থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় ১৬ কি.মি.দূরে এটি অবস্থিত। পত্নীতলা থানার দিবর ইউনিয়নের দিবর গ্রামেই এ দীঘিটির অবস্থান। প্রাচীন জলাশয়ের কেন্দ্র স্থলে অতি বিস্ময়কর একটি প্রাচীন কীর্তির অস্তিত্ব দেখা যায়। প্রায় বর্গাকারে খনিত ছিল এ সুবিশাল দীঘিটি। এর প্রত্যেক বাহু ছিল প্রায় ১০০০ মিটার দীর্ঘ।[৩৯] এ দিবর দীঘির মাঝখানে একটি জয় সূচক স্তম্ভ আকাশের দিকে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সেটিকেই বলা হয় দিব্যক জয় স্তম্ভ। দীঘিটি স্থানীয় জনগণের কাছে কর্মকালের জলাশয় নামে পরিচিত। দীঘির পাড়গুলো খুব সম্ভব প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ধসে

পড়ে কাকচর বা বকচরে রূপান্তরিত হয়ে শতশত একরের কৃষিভূমিতে (ধানি জমি) পরিণত হয়েছে। প্রায় মজে যাওয়া জলাশয়টি আপাতত একটি স্বল্প বিস্তর জলাশয়ে রূপ নিয়েছে। হাল আমলের (বিংশ শতাব্দীর নব্বই এর দশকে) সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের অনুমতিক্রমে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উদ্যোগে মজে যাওয়া জলাশয়ের জল নিষ্কাশন করে সেখানে ২০ একর আয়তনের একটি জলাশয় নতুন করে খনন করা হয়েছে। নতুন করে খননকৃত জলাশয়ে বর্তমানে মাছের চাষ হচ্ছে। কাকচরে বা বকচরে শত শত একর ভূমিতে ইরি-বোরো ধানের চাষও হচ্ছে।[৪০] এটি ৫০/৫৫ বিঘা জমির ওপর অবস্থিত গোলাকার বিশিষ্ট। দীঘির মাঝখানে অবস্থিত আট কোণ বিশিষ্ট গ্রানাইট পাথরের ৩১ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা এ স্তম্ভটি। পানির নিচের অংশ ৬ পুট ৩ ইঞ্চি। এর ব্যাস ১০ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং প্রতিটি কোণের পরিধি ১ ফুট ৩.৫ ইঞ্চি। স্তম্ভটির গায়ে কোনো লিপি নেই। স্তম্ভের উপরিভাগ খাজকাটা অলঙ্করণ দ্বারা সুশোভিত। স্যার আলেক জাণ্ডার কানিংহ্যাম ১৮৭৯ খ্রি. স্তম্ভটি পরিদর্শন করেন। তাঁর বর্ণনা মতে, স্তম্ভটিতে ৯টি কোণ আছে এবং এক কোণ থেকে আর এক কোণের দূরত্ব প্রায় ৩০ সেন্টিমিটার। স্তম্ভের উর্ধ্বাংশে আছে পর পর তিনটি বলয়াকারের স্ফীত রেখা-অলঙ্করণ। তার উপরে সর্বোচ্চ অংশে আছে আমলকের অলঙ্ককরণ এবং এর শীর্ষদেশে মুকুট জাতীয় অলঙ্ককরণ।[৪১] স্থানীয় ইউপির চেয়ারম্যান যিনি খনন কাজ করেছিলেন তিনি জানিয়েছেন যে, স্তম্ভটির ভিত্তিদেশ অত্যন্ত বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে নির্মিত হয়ে প্রোথিত হয়েছিল বলে বহুশত বছর ধরেও স্তম্ভটি একটুও হেলে পড়েনি এবং বরাবরের মতো ঋজু অবস্থায় এটি জলাশয়েও দণ্ডায়মান।[৪২] যদি এর তলদেশ বিভিন্ন স্তবকে নির্মিত না হয়ে সোজাসুজিভাবে নির্মিত হতো তবে স্তম্ভটি যে এতদিন হেলে পড়তো তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। বিশেষ করে জলাশয়ের নরম মাটিতে এর অবস্থান জনিত কারণে। দীঘির মধ্যস্থিত জয়স্তম্ভটি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যেসব তথ্য পাওয়া যায় তা হলো দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও হত্যা করার সাফল্যকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে দিব্যক রাজা এ জয়স্তম্ভটিসহ দীগিটি নির্মাণ করেন।[৪৩] আবার ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে,দিব্যকের রাজত্বকালে পাল যুবরাজ রামপাল বরেন্দ্র উদ্ধারের চেষ্টা করে দিব্যকের কাছে পরাজিত হন। দিব্যক তাই এ সাফল্যের স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে দীঘির মধ্যস্থিত এ স্তম্ভটি নির্মাণ করে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে ভীম এ স্তম্ভটি নির্মাণ করেন এবং পিতৃব্য দিব্যকের স্মৃতি রক্ষায় স্তম্ভটি তার নামে উৎসর্গ করেন। যে উদ্দেশ্যেই এ স্তম্ভটি নির্মাণ করা হোক না কেন, দীঘির মধ্যস্থিত এ স্তম্ভটি আজো অম্ল্গান হয়ে আছে। অধুনা এটি একটি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে আত্মপ্রকাশিত হয়ে ওঠেছে। দেশের ও বিদেশের বহু পর্যটক বর্তমানে এ ইতিহাস-ঐতিহ্যের স্বাক্ষর সম্বলিত স্থানটিতে আসেন।পর্যটন কেন্দ্রের উপযুক্ত এ স্থানটিতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা মিললে আরো আকর্ষণীয় ও মনোরম হয়ে ওঠবে।

যোগীর ঘোপা

পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার থেকে প্রায় ১২ কি.মি. উত্তর- পশ্চিমে এবং মঙ্গলবাড়ির ভীমেরপান্টি বা গড়ুর স্তম্ভ থেকে ১২ কি.মি. থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে পত্নীতলা থানার ঘুকশি বিলের সন্নিকটে পূর্বদিকে যোগীর ঘোপাটি অবস্থিত। এটি ছিল নাথপন্থীদের একটি বিখ্যাত ধর্মকেন্দ্র। উত্তরবঙ্গে যে তিনটি নাথ ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল তার মধ্যে এটি ছিল অন্যতম।[৪৪] অপর দু'টি হলো দিনাজপুরের গোরকই এবং বপুড়া জেলার যোঘীর ভবন। পাল আমলের শেষ পর্যায়ে বৌদ্ধ

ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ দেখা দেয়। এ সব মতবাদের মধ্যে সহযান মতবাদ অন্যতম। নাথ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মৎস্যেন্দ্র নাথ। বাংলাদেশে এদের প্রধান কেন্দ্র ছিল কুমিল্লা শহরের চার মাইল পশ্চিমে সালবানপুর গ্রামে। মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন গোরক্ষনাথ।[৪৫] নাথ ধর্মের প্রবর্তক ও আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন আদিতে একজন সহজিয়া বৌদ্ধ গুরু। শিষ্য গোরক্ষনাথের সময়ে সারা বাংলায় নাথ ধর্মের প্রসার ঘটে। বাংলাদেশের বাইরে ভারতেও এর বিস্তার ঘটে। বর্মণ-সেন আমলে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেলেও টিকে থাকে নাথ ধর্ম। এরপর মুসলিম আমলেও বাংলায় নাথধর্ম সগৌরবে টিকে থাকে। আলোচিত যোগীর ঘোপাটি ঠিক কোনো আমলে নির্মিত হয়েছিল তার নির্ভরযোগ্য কোনো সূত্র পাওয়া যায় না। আদিতে নাথধর্ম কেন্দ্রগুলোতে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম চর্চা হতো।[৪৬] পরবর্তীতে এগুলো নাথ ধর্মকেন্দ্র হিসেবে টিকে থাকে। সম্ভবত পত্নীতলা থানার যোগীর ঘোপাটিও ছিল সে ধরনের একটি কেন্দ্র।

ঠাকুরমান্দার রঘুনাথ মন্দির

মান্দা থানা সদর থেকে প্রায় ১৫কি.মি. দূরত্বে এর অবস্থান। নাটোরের রাণীভবানী ১৭৮০ সালে মান্দায় রঘুনাথ মন্দিরটি নির্মাণ করেন।[৪৭] এর গঠন পিরামিডের মতো। দ্বিতল আয়তন বিশিষ্ট এ মন্দিরটি অত্র অঞ্চলের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে লালন করে আছে। যতদূর জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসনামলে এ মন্দিরকে কেন্দ্র করে মাসাধিককাল ব্যাপী মেলা চলতো। অবিভক্ত ভারতের আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল ও ভুটান প্রভৃতি স্থান হতে ব্যবসা-বাণিজ্য, দর্শন ও দেব আরাধনার নিমিত্তে লোকজন এখানে আসতেন। মন্দিরের সম্মুখে ডরিক স্তম্ভবিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা আছে। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের হলেও এর অভ্যন্তরে স্থাপিত মূর্তিটি আরো পুরাতন। মান্দার বিলে খননকালে প্রাপ্ত পুরাতন মূর্তিটি এ মন্দিরে স্থাপন করা হয়।[৪৮] এ স্থানের গুরুত্ব বিবেচনায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে পরপর নয়টি জমিদারের কাচারি স্থাপিত হয় এবং উক্ত রঘুনাথ মেলা আরো জাঁকজমকপূর্ণ হয়ে উঠে। এ মন্দিরকে নিয়ে কিংবদন্তি ছড়িয়ে আছে। কিংবদন্তিটি এমন-হিন্দু প্রধান বর্তমানের কশবা মান্দায় (নামান্তরে ঠাকুর মান্দা) যে 'রঘুনাথ মন্দির 'আছে তার সেবায়েত ছিলেন জনৈকা 'মান্দা দেবী' এবং পূজারী ছিলেন জনৈক রঘুনাথ। পরোহিত রঘুনাথের দেবারধনায় আর মান্দা দেবীর পরিচর্যায় বহু অলৌকিক ঘটনা এ ধর্ম মন্দিরে। এমন কি মন্দিরের পূজা উপাচার হিসেবে সোনার চোখ সম্প্রদান করে অনেক জন্মান্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। নানা মনঃস্কামনা পূর্ণ হবার খবরসহ আরো কতিপয় অলৌকিক ঘটনা বিবরণ অবিভক্ত ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়লে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী,বহুদর্শনার্থী এবং ভক্তবৃন্দসহ সমস্যা জর্জরিত মানুষ পাপমুক্তি ও মনোকামনা পূরণের প্রত্যায় দলে দলে এসে সফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতেন।[৪৯] এভাবেই ঠাকুর মান্দার রঘুনাথ মন্দিরের কাহিনী কিংবদন্তিটি অত্র মান্দা অঞ্চলের লোকসমাজে প্রচলিত আছে।

কুশুম্বা মসজিদ

মান্দা থানা সদর হতে তিন মাইল দক্ষিণে নওগাঁ-রাজশাহী সড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ৮নং কুশুম্বা ইউনিয়নের অন্তর্গত কুশুম্বা গ্রামে অবস্থিত-কুশুম্বা শাহী মসজিদ এখনও ঐতিহ্য নিয়ে দণ্ডায়মান। দীঘির পশ্চিম পাড়ে ধূসর বর্ণের কুশুম্বা মসজিদ নওগাঁ জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। যতদূর জানা যায়, হিজরি ৯১০ সনে গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দিন হোসেন শাহের

সময় এ মসজিদ ও এর সংলগ্ন ৭৭ বিঘা জলা বিশিষ্ট দীঘি স্থাপিত হয়।[৫০] কুশুম্বা দীঘির দৈর্ঘ্য ১২৫০ ফুট, প্রস্থ ৯০০ ফুট। এর পাহাড় অতি উঁচু। কথিত আছে যে, দীঘির পানিতে পারদ মিশ্রিত থাকায় কোনো কচুরিপানা জমতে পারতো না। কুশুম্বা মসজিদ উঁচু করে তৈরি করা ভিতের ওপর নির্মিত। বাংলাদেশে আরও কয়েকটি মসজিদ অনুরূপ খিলানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাধারণত ভূমিকম্প বা বন্যা-প্রবণ এলাকাতে এভাবে ভবন নির্মাণ করা হয়। তার ফলে ভবনগুলো বেশি দিন দীর্ঘস্থায়ী হয়। সম্ভবত কুশুম্বা মসজিদটিও এ নির্মাণ কৌশলের জন্য আজও অক্ষত অবস্থায় আছে। কুশুম্বা মসজিদ মুসলিম স্থাপত্যকলার এক অনুপম নিদর্শন। জনশ্রুতি আছে যে, গৌড়ের বেগম কুসুম বিবি (মতান্তরে সোনাই বিবি) এক গভীর রাতে রাজপ্রাসাদের বাহির থেকে ভেসে আসা বাঁশির সুর লহরীতে ভাবাভিভূতা হয়ে পড়লে তাতে বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে ধর্মীয় বিধান মতে উক্ত বেগমকে পরিত্যাগ করে প্রাসাদ হতে বিতাড়িত করেন। বিতাড়িত বেগমের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সেই বংশীবাদককে খোঁজে তাঁর নিকট আনা হলে বেগম তাকে ধর্মপুত্র বানিয়ে সঙ্গে প্রয়োজনীয় ধন-সম্পদ নৌকা মাঝি মাল্লাসহ প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়েন। বংশীবাদক ছিলেন একজন সৈনিক, নাম কালা পাহাড় (বীরত্বসূচক ডাক হাক)। ধর্মপুত্র কালা পাহাড়কে সঙ্গে নিয়ে বেগম নিরুদ্দেশ্যের পথে চলতে চলতে এক গভীর অরণ্যে নামেন এবং বসতি স্থাপনের চেষ্টা করেন। প্রথমে তারা একটি বসতবাড়ি স্থাপন পূর্বক সংলগ্ন স্থানে একটি মাঝারী আকারের দীঘি স্থাপন করেন। গৌড়স্থ সোনা মসজিদের নামানুসারে দীঘির নাম রাখেন সোনাদীঘি যা এখনও কালের স্বাক্ষর হসেবে বিদ্যমান। এরপর বেগম কুসুম বিবি ধর্মপুত্র কালা পাহাড়কে অনুমতি দিয়ে এ মসজিদ নির্মাণ ও তৎসংলগ্ন ৭৭ বিঘা জলা বিশিষ্ট দীঘিটি খনন করেন। বেগমের নামের সাথে শাহ সুলতানের স্মৃতি রক্ষার্থে শাহী শব্দ সংযোগ করে মসজিদটির 'কুশুম্বী শাহীমসজিদ' নামকরণ হয়। পরে কালানুক্রমে তা কুশুম্বা শাহী মসজিদ নামেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠা পায়। মতান্তরে আরও জানা যায় যে, উক্ত কুসুম বিবি এখানে অবস্থানকালে খোদ আরব এলাকা থেকে জনৈক কামেল ফকির তার সান্নিধ্যে এলে বেগম উক্ত ফকিরের কেরামতিতে দূর থেকে কৃষ্ণ পাথর এনে ফকিরের নেতৃত্বে এ কালাপাহাড়ের সহায়তায় এ মসজিদ ও দীঘিটি খনন করেন। যেভাবেই হোক না কেন, কৃষ্ণ পাথরে নির্মিত ও নানারূপ সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত এ মসজিদের নির্মাণকাল সত্যিই ঐতিহ্যময় ও দর্শনীয়। পাথরের খোদাই করা কারুকার্য দেশী ও বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর মেহরাবের প্রতিকৃতি বর্তমানে পাঁচ টাকার নোটে সন্নিবেশিত করে দেশময় এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। এভাবেই কুসুম বিবির নামানুসারে প্রথমে মসজিদ এবং পরে এলাকার নাম 'কুশুম্বা গ্রাম' হিসেবে পরিচিত পায়। মসজিদের শিলালিপি এবং প্রতিষ্ঠাকাল সম্পর্কে মানুষের মনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। তবে কেন্দ্রীয় প্রবেশ পথের শিলালিপি থেকে প্রমাণিত হয় যে এ মসজিদ ৯৬৬ হিঃ ১৫৫৮ খ্রিঃ শেরশাহের বংশধর আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের নামানুসারে (১৫৫৪-৬০) নির্মিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরে হোসেন শাহের একটি শিলালিপি আছে। এতে ৯১০ হিঃ / ১৫০৩ খ্রিঃ হোসেন শাহের শাসনামলে মসজিদটি নির্মিত বলে অনেকে ধারণ করে থাকেন। কিন্তু এ লিপিটি কুশুম্বা মসজিদে পরে কোনো এক সময় স্থাপন করা হয়েছে বলে ঐতিহাসিকগণ মত প্রকাশ করেছেন। মাহেনও পত্রিকায় একজন প্রাবন্ধিক হোসেন শাহের লিপির যে পাঠ উল্লেখ করেছেন ;তার অর্থ

হলো-"আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ (স:) তাহার প্রেরিত রাসুল। সুধী ও ন্যায় পরায়নদের রক্ষক এবং দুনিয়া ও দ্বীনের বাদশাহ সৈয়দ আসরাফ আল হোসেনের পুত্র সৈয়দ আবুল মোজাফফর হোসেন শাহ। আল্লাহ পাক তাহার বাদশাহী ও রাজত্ব কায়েম করুন,সন দশম হিজরি।"[৫১] বাংলার স্থাপত্যে বিশেষ করে গৌড়ীয় স্থাপত্য রীতিতে কুশুম্বা মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। সমচতুস্কোণ মসজিদটির ছাদ বাংলা কুড়েঘরের চালার মতো ঈষৎ ঢালু। মসজিদের দৈর্ঘ্য ৫৮ ফুট এবং প্রস্থ ৪২ ফুট। কুশুম্বা মসজিদে দু সারিতে ছয়টি ছোট অর্ধগোলাকৃতি গম্বুজ আছে। কুশুম্বা মসজিদটি মূলত ইটের তৈরি। ইটের দেয়ালের ভিতর ও বাইরে দানাদার কালো পাথর দিয়ে আচ্ছাদন দেয়া হয়েছে। যেন তা সহজে বুঝার উপায় নেই। মসজিদের চারকোণায় চারটি মিনার আছে। প্রত্যেকটি মিনার কারুকার্যময় রেখার দ্বারা একাধিক স্তরে বিভক্ত। মিনারের চুড়াগুলো অনেক আগেই ভেঙ্গে গেছে। কুশুম্বা মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে সুন্দরভাবে খোদাই করা কালো আগ্নেয় প্রস্তরের তিনটি মিহরাব আছে। মসজিদের ভিতর উত্তরে পাশে গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদের মতো একটি পর্দাঘেরা উঁচু মঞ্চ আছে। এটিকে জেননা গ্যালারি বলা হয়। গ্যালারিতে উঠার জন্য পাথরের সিড়ি আছে। মসজিদে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে ছুঁচালো খিলানবিশিষ্ট তিনটি প্রবেশ পথ আছে। দক্ষিণ-উত্তর দেয়ালে দু'টি খিলানযুক্ত দরজা খুবই দেখতে চমৎকার। খিলানগুলো আবার তরঙ্গায়িত পলকাটা। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দু'টি করে পাথরের ঝাঁঝরি বা গ্রিল করা জানালা আছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগের দেওয়াল উদগত রেখার কারুকার্য দ্বারা দুটি স্তরে তা বিভক্ত হয়েছে।

এছাড়াও নওগাঁ জেলায় আরো কিছু ঐতিহাসিক স্থান ও পুরাকীর্তির নিদর্শন সম্বলিত দৃশ্য ও চিত্র বিভিন্ন উপজেলায় ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে দেখতে পাওয়া যায়। এসবের ঐতিহাসিক আবেদনগুলো প্রায় বিলীন হবার পথে। আবার কোনো কোনোটির অস্তিত্ব অনুসন্ধান করে বের করা ছাড়া গত্যান্তর নেই। তাই এসবকে ঐতিহাসিক স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ আজ খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে।

তথ্যনির্দেশিকা

১. প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ* (নওগাঁ: জেলা প্রশাসন ১৯৯৮), পৃ. ৯।
২. মো: শহীদুল্লাহ মিয়া (সম্পাদিত), *লেখচিত্রে নওগাঁ* (বগুড়া: মুকুল প্রেস এণ্ড প্যাকেজেস লি. ১৯৮৭), পৃ. ২৫।
৩. প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯।
৪. *তদেব*, পৃ. ২৭।
৫. অনীক মাহমুদ, *রাজাকৃষ্ণেন্দ্র রায়* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), পৃ. ৯।
৬. মো: শহীদুল্লাহ মিয়া (সম্পাদিত), *লেখ চিত্রে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
৭. প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮।
৮. খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল,*নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস*, (চট্টগ্রাম: ইষ্টার্ণ কমার্শিয়াল প্রেস, ১৯৭৪), পৃ. ১৪৯।
৯. *তদেব*, পৃ. ১৫১।
১০. ড.মোহাম্মদ শামসুল আলম,*মহাদেবপুর উপজেলার জমিদার পরিচিতি* (বগুড়া:আমারউত্তরাধিকার,২য়বর্ষ: ২০০৮),পৃ. ১৪।
১১. *তদেব*, পৃ. ১৪।
১২. *তদেব*, পৃ. ১৫।
১৩. খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল, *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস* , *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১।
১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,*ছিন্নপত্রাবলী* (কলকাতা: বিশ্বভারতী, পুনরমুদ্রণ, বৈশাখ ১৯৬৩), পৃ. ১৭০।
১৫. আহমদ রফিক,*রবীন্দ্রস্মৃতি: পতিসর অন্যমাত্রায় অনন্য* (বগুড়া: শকুন্তলা,২৫ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২১।

[১৬] ড.মোহাম্মদ শামসুল আলম,*পতিসরের জমিদার ও মানুষ রবীন্দ্রনাথ* (জেলা প্রশাসন নওগাঁ: ২৫ বৈশাখ ১৪১৬), পৃ. ৪৭।
[১৭] খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল, *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩।
[১৮] *তদেব* , পৃ. ২৯৪।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ২৯৪।
[২০] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*,পৃ. ২১।
[২১] *তদেব*, পৃ. ১১।
[২২] খান সাহেব মোহাম্মদ আফজাল, *নওগাঁ মহকুমার ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।
[২৩] মুহ.মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, (ঢাকা: গতিধারা ১৯৯৮), পৃ. ৩০২।
[২৪] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।
[২৫] মুহ.মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।
[২৬] মো: শহীদুল্লাহ মিয়া (সম্পাদিত),*লেখচিত্রে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।
[২৭] *তদেব*, পৃ. ১৭।
[২৮] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১।
[২৯] মুহ.মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯।
[৩০] *তদেব*, পৃ. ৩৫৯।
[৩১] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।
[৩২] মো: জালাল উদ্দিন, *বদলগাছী উপজেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস* (বগুড়া: ইউনিক অফসেট প্রেস, ২০০৬), পৃ. ৫১।
[৩৩] *তদেব*, পৃ.৫১।
[৩৪] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২।
[৩৫] *তদেব*, পৃ. ১২।
[৩৬] মো: জালাল উদ্দিন, *বদলগাছী উপজেলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।
[৩৭] মুহ.মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৮
[৩৮] *তদেব*, পৃ. ৩২২।
[৩৯] *তদেব*, পৃ. ৩২১।
[৪০] *তদেব*, পৃ. ৩২১।
[৪১] *তদেব*, পৃ. ৩২২।
[৪২] *তদেব*, পৃ. ৩২২।
[৪৩] মো: শহীদুল্লাহ মিয়া (সম্পাদিত), *লেখচিত্রে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬।
[৪৪] মুহ. মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ- ২৯৪।
[৪৫] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭।
[৪৬] মুহ.মমতাজুর রহমান (সম্পাদিত),*বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৫।
[৪৭] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।
[৪৮] *তদেব*, পৃ.২১।
[৪৯] মো: শহীদুল্লাহ মিয়া (সম্পাদিত), *লেখ চিত্রে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩।
[৫০] *তদেব*, পৃ. ১০৬।
[৫১] প্রফেসর মো: ইশরাক আলী দেওয়ান ও অন্যান্য (সম্পাদিত),*কালান্তরে নওগাঁ*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪।